শ্রাদ্ধ যত আমার, রাম নাম তোমার

'পাগল মন– মন রে, মন কেন এত কথা বলে।' কথা না বলে মনের আর যে কোনো গতি নেই, তাই। কদিন থেকে মনটায় উদাসী ভাব, তাই কলম ধরিনি। ২৮ অক্টোবর '২৩-এর আগের রাত। বিকেলে গিয়েছিলাম ঢাকার অদূরে, গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে– এক জরুরি মিটিংয়ে। মিটিং শেষ হতে রাত সাড়ে আটটা। সাভার থেকে গাবতলী পর্যন্ত যানজট। কেন এই যানজট? গাবতলীতে প্রতিটা যান তল্লাশি করে একটা একটা করে ঢাকার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে তাই। পেছনে কত মাইল জানজট বাধলো– ওটা কোনো বিবেচ্য বিষয় না। উদ্দেশ্য ঢাকায় আসতে মানুষকে পথে তল্লাশির নামে আটকে রাখতে হবে, অথবা ভোগাতে হবে। পুলিশ কি জানে না, ঘটনার আগের রাতে গাড়িতে করে কোনো বিস্ফোরক কোনো পাগলেও বহন করে না? পুলিশ তল্লাশি করছে, এ খবর তারা রাখে। কখন ও কিভাবে বিস্ফোরক আসে– এ বিষয়ে আমার তুলনায় পুলিশের অভিজ্ঞতা ঢের বেশি। তবু তল্লাশির নামে সাধারণ মানুষের হয়রানি, মানসিক নির্যাতন। যারা আসছেন, সবাই কি মহাসমাবেশে যোগ দিতে আসছেন? তাহলে আমাকে এ ভোগান্তি পোহাতে হবে কেন? এই চার কিলোমিটার আসতে আমার আড়াই ঘণ্টা লেগেছে। ডায়াবেটিস ও প্রেসারের রোগী। পথে অসুস্থ হয়ে অক্কা পাওয়ার অবস্থায় চলে গিয়েছিলাম। তাই এই বিতৃষ্ণ বিষয়গুলো লিখছি। আর কত? দেশচালকরা আমাদের মত সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা ভাবেন না কেন? দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে বিদেশে থাকতে পারিনি। দেশে থেকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে যদি কিছুই না বলতে পারি, তাহলে কেন এই 'নরকবাস'! আবার দেশে ভালোভাবে বাস করতে গিয়ে শতেক প্রতিবন্ধকতার মুখে কখনো ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণায় মনটা রি রি করে। এদেশে জন্মিয়ে কি পাপ করেছি? কোনো ঠুনকো অযুহাত দেখিয়ে কোনো কোনো দিনে ইন্টারনেট কানেকশন খুব মন্থর থাকে। ফোনের বাটন টিপতে টিপতে হাত ব্যথা হয়ে যায়। কেন এমন হয়? হঠাৎ করে কোথাও সমাবেশের আগে বা সমাবেশের দিন বাস-ট্রাক, নৌকা, রিক্সা, নছিমন ধর্মঘট শুরু হয়। যারা ধর্মঘট করে তারা কারণ একটা দেখায়। তারা কি মনে করে যে, সাধারণ মানুষ এসব বোঝে না, চিঁড়ে খেয়ে বেঁচে আছে? প্রতিটা প্রতিবাদে ও নির্দিষ্ট দিনে বাস ভাংবে, বাসে আগুন জ্বলবে, টেলিফোন টাওয়ারে আগুন ধরবে, পূজামণ্ডপ ভাংচুর হবে, অগণিত মানুষের নামে কেস-বাণিজ্য, গ্রেফতার-বাণিজ্য হবে; কেবল এর জন্য প্রকৃত দায়ি ব্যক্তি কে বা কারা তা তদন্তে কোনোদিনই বেরিয়ে আসবে না। অথবা তদন্ত রিপোর্টের ওপর আস্থা রাখা যাবে না যে এটা প্রকৃত ঘটনার রিপোর্ট, না কি দলবাজির রিপোর্ট। এ আবার কোন আজব দেশে বসবাস? প্রতিটি ঘটনা আসে নব নব বেশে, অভিনব বাঙালি কৌশলে, অভাবিত পথে।

একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। বাড়ির সামনে স্কুল, ভোটকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ভোট চলছে। স্কুলের মাঠে কমপক্ষে সত্তর-আশিজন ভোটার লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। টিভি-ক্যামেরাম্যান এসে ছবি তুলে নিয়ে গেল। একই ভোটার সকাল থেকে বাদ-যোহর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। কউবা অনেকক্ষণ পর পর ভিতরে যাচ্ছে, আবার বেরিয়ে এসে বাইরে ঘোরাঘুরি করে অনেকক্ষণ পর একই লাইনে দাঁড়াচ্ছে। টিভিতে ছবিসহ প্রচার চলছে, ভোট সুষ্ঠু হচ্ছে। লাইনে লোকের ঘাটতি নেই। শুধু একদলের লোকজনই ঘোরাঘুরি করছে। আমার এক সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, ভোট দিতে গিয়েছিলেন'? উত্তরে বললেন, "গিয়েছিলাম, কিন্তু ভোট দিতে পারিনি। আমাকে সালাম দিয়ে এক ছেলে বললো, 'স্যার, এসে আর কি করবেন, আপনার কষ্টটা অন্য কেউ করে দিয়েছে'।" এদেশে সংঘটিত কাণ্ডকারখানা ও চিন্তাভাবনার অভিনব কুটিলতা দেখে ভাবি, 'কত রঙ্গের পিরিতি তুমি জানো রে

বন্ধু, কত রঙ্গের পিরিতি তুমি জানো-ও! তুমি লাগাইয়া পিরিতের রশি, দূরে বইসা টানো রে বন্ধু, কত রঙ্গের...।' এদেশের রাজনীতিকদের কুটবুদ্ধি ও রঙ্গ-রসের কি অভাব আছে? আসলে একটা কথা জানি, 'খলের ছলের অভাব হয় না'। এর পরও রাজনৈতিক দলগুলো জেদ করে তাদের কর্মকাণ্ডের উপর সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস রাখতে বলে। আচ্ছা বলুন তো, দুই সন্তানের জননীর ভার্জিনিটি টেস্টের জন্য টাকা খরচ করে মেডিক্যাল বোর্ড বসানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

আমি কয়েকদিন আগেও লিখেছিলাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' কথাটা উচ্চারণ করতে বুকের ছাতি দুই ইঞ্চি ফুলে উঠতো, এখন আর ফুলে ওঠে না। কেন ওঠে না, এর উত্তর সাধারণ মানুষকে এদেশের দলবাজ বুদ্ধিজীবী ও চর দখল-সদৃশ কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত, দুর্গন্ধযুক্ত রাজনীতিতে মত্ত দেশচালকদের দিতে হবে। এ কৈফিয়ত চাওয়া আমার মতো ক্ষুদ্র মাস্টারসাহেবের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। এই অধিকারটুকু পাওয়ার জন্য বায়ান্ন বছর লাগছে কেন? দেশের সাধারণ মানুষ রাজনীতি-সচেতন হলেও আনুমানিক দশ থেকে পনেরো শতাংশ লোক সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করে। এদের মধ্যে অধিকাংশ বাকি পঁচাশি শতাংশ জনসাধারণের সম্পদ লুণ্ঠনের কৌশল আয়ত্ব করে ফেলেছে। তারা সাধারণ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে জনকোষাগার আত্মসাতের ব্যবসা করে। কথাবার্তায়, ইশারা-ইঙ্গিতে দেশের মালিক বলে নিজেদের দাবি করে। এসব তথ্য কোনোটা নিজ কানে শোনা, কোনোটাবা দৈনিক পত্রিকায় পড়া। আমরা তো অন্ধ নই, এ পোড়া চোখে সবকিছুই দেখছি, পর্যবেক্ষণ করছি। মাস্টারসাহেব হওয়ায় ঘোরানো-প্যাঁচানো বিষয় বুঝিনে, লিখতেও পারিনে, তাই সোজাকথা সোজাসুজি লিখি। এতে স্বার্থান্বেষী অনেকের মাথাব্যথার কারণ হয়, এটাও বুঝি। কিন্তু এই দশ-পনেরো শতাংশ লোক দেশটাকে লুটতরাজ করে খাবে, গুরুর সম্পত্তি বলে ভাববে, আর এদেশের একজন দেশ-সচেতন শিক্ষক হয়েও মুখ বন্ধ করে থাকবো, এটা কি হয়?

ভালোভাবে বসবাস করে, কোনো দলে না ভীড়েও অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা এদেশে কই? অশালীন কথা না বলেও শালীন-ন্যায্য কথা বলার অধিকারই-বা কই? বিভিন্ন অপকৌশলে আপনাকে থামিয়ে দেওয়া হবে, কিংবা আপনার ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে পচিয়ে দেওয়া হবে; আপনি গুম হয়ে যাবেন, বা আপনার অকাল মৃত্যু হবে। বাঙালির সংস্কৃতি ভিন্ন, কুটবুদ্ধি-কুটকৌশল ভিন্ন, মন-মানসিকতা ভিন্ন। আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বে জন্ম নিয়ে, সেখানকার পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে এদেশের রাজনীতিকদের কুটকৌশল ধরতে পারা কঠিন। আমি জানি বাঙালির এ কুটকৌশলের খেলায় আমরা যেভাবে ভুগি, তারা কোনোদিনই তা বুঝবে না।

অসংখ্য দলকানা প্রাবন্ধিকের লেখা বিভিন্ন পত্রিকার বদৌলতে প্রতিদিন পড়ছি। দলকানা এই প্রাবন্ধিকেরা কি ভাবতে পারছেন না যে, নির্দলীয়-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই 'পিলো পাচিং খেলা' তো এদেশে অনেকবারই দেখলাম, লাভটা কী হলো? ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই যে, আমি নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলছি। আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, নির্দলীয় সরকার আনুন, আপত্তি নেই। কিন্তু দেশের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আরো অনেক ফ্যাক্টর বিবেচনায় আনুন। টেকসই উন্নতির ধারা সুনিশ্চিত করুন। ভাওতাবাজির রাজনৈতিক ধারা পরিহার করুন, তা যে দল বা জোটই ক্ষমতায় আসুক, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি কোনো দলের বিরুদ্ধে নই, তাদের কুটিল ভাবনাচিন্তা ও দেশবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে, দলবাজির বিরুদ্ধে।

আমরা বারবার মুরগি পোষানি দিই বনবিড়ালের কাছে, কখনো কখনো বনবিড়াল বাদ দিয়ে শেয়ালের কাছে। কিন্তু আমাদের মুরগির যে দশা হবার কথা তাই-ই হয়। এদেশের প্রকাশ্য বুদ্ধিজীবী, ছদ্মবেশী বুদ্ধিজীবীরা মুরগির অবস্থাকে বিবেচনায় আদৌ আনেন না। আমার মতো অজাত মাস্টারসাহেবের কথা কানেও তোলেন না। আমাদের উদ্দেশ্যের দিকে আগে তাকাতে হবে। ভাবতে হবে– উদ্দেশ্য বনবিড়াল অথবা শেয়াল পোষা, না কি মুরগিকে রক্ষা করা? না কি মুরগি-বনবিড়াল নিয়ে আজীবন লুকোচুরির খেলা করা? এ খেলার বয়স কিন্তু বায়ান্ন বছর পেরিয়ে গেছে। আমরা কোনোক্রমেই মুরগিকে নিরাপত্তা দিতে পারছি না। যে কোনো মূল্যে দেশকে টিকিয়ে রাখতে হবে। দেশকে বাঁচাতে হলে জরুরি ভিত্তিতে বেশ কিছু কাজ এখনই করতে হবে। প্রথমেই নির্দলীয় সরকার নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারলে এদেশের দেশসচেতন ও দেশপ্রেমী মানুষগুলো প্রয়োজনে জাতিসংঘের কাছে এ বিষয়ে আবেদন জানাতে পারেন। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্দলীয় সরকার ও সংবিধান পরিবর্তন বিষয়ে একটা গণভোট হতে পারে। আমার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, এতে সাধারণ মানুষ পজিটিভ মত দেবে। অতপর শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন একটা নির্দলীয় সরকার গঠন করতে হবে। সরকারে যেন দল-তোষণ ও প্রভু-তোষণ লোক না ঢুকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সরকারের মেয়াদ কমপক্ষে তিন বছর হবে। দলমত ভুলে দেশপ্রেমী মানুষ সে সরকারকে সহযোগিতা করবেন। নির্দলীয় সরকারের প্রধান কাজ হবে: সরকারের বেশ কয়েকটা বিভাগকে পর্যায়ক্রমে পুনর্গঠন করা। যে কোনো মূল্যে শক্ত হাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ও দুর্নীতির সাথে জড়িত লোকগুলোকে খুঁজে বের করে আইন ও বিচারের আওতায় আনা। কোনো আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে দেশের স্বার্থের ব্যাপারে মাথা নত না করা। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করে যতটা পারা যায় আয়বৈষম্য কমিয়ে আনা। অবকাঠামো খাতে খুব বেশী টাকা ব্যয় না করে পরিমিত ব্যয় করা। জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষায় টাকা ব্যয় করা। শিক্ষা-প্রশাসন কাঠামো ও শিক্ষার মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, এটাকে পুনর্গঠিত করা। এক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বেশি পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করার কাজটা যথাযথ হয়নি। কারণ আগের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা ছিল শিক্ষা-প্রশাসনিক ও বাস্তবায়ন ব্যর্থতা। সে কারণে 'মশা মারতে কামান দাগা'র দরকার ছিল না। রিভিউ করলেই চলতো। বর্তমান নব্য শিক্ষাব্যবস্থা সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হবে, তেমনটি আশা করা যায় না। এতে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষামান আরো দুর্বল হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি। তবে এজন্য নতুন প্রজেক্টের নামে বেশি টাকা বরাদ্দ না করে রিভিউ করলেই চলবে।

দেশের অর্থব্যয় ও ব্যবহারে 'বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা'র প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা জরুরি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে একশ টাকা ব্যয় করে রাষ্ট্রের জন্য চল্লিশ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জননীতি বন্ধ করতে হবে। দুর্নীতি এমন একটা বিষয় যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে একটা দেশ ধ্বংস হতে দেরি লাগে না। দুর্নীতির ব্যাপকতা রোধ করতে পারলে অল্প সময়েই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হতে বাধ্য। শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান এর বাস্তব প্রমাণ। দেশ গড়ার জন্য দেশ-পরিচালকদের সততা ও সদিচ্ছাই যথেষ্ঠ। তাই দেশে সৎ, যোগ্য ও সুশিক্ষিত লোকদেরকে দেশসেবা, সমাজসেবা ও নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন করা এবং নীতিহীন, গলাবাজ, চাটুকার ও লাঠিয়াল বাহিনীর আগ্রাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা প্রয়োজন। সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির স্বার্থকতা এখানেই । সমাজে প্রতিহিংসা, দলাদলি, বিভাজন, পারস্পরিক বিদ্বেষ সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে রোধ করতে হবে। অতপর সংবিধান পরিবর্তনে হাত দিতে হবে। এ বিষয়ে অনেক কথা আছে, যা এত অল্প পরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলবো,

সরকারি দলসহ প্রতিটা রাজনৈতিক দলকেই জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে এবং তাদের কর্মব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর হাতে কর্মভার ন্যাস্ত করতে হবে, যাতে সরকার ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভারসাম্য বজায় থাকে। এরপর দেশে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে। এদেশে 'ভালুকের হাতে খন্তা' চলে যাওয়ায় তারা খন্তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। খন্তাকে ভালুকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে, নইলে শ্রাদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণ ও দেশের এবং রামনাম অর্জন করছে লাঠিয়ালবাহিনী সজ্জিত রাজনৈতিক দল।

(৪ নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ